গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

অন্নদাশঙ্কর রায় বিংশ শতকের শেষ অতন্দ্র প্রহরী। যিনি একদিকে দেখেছেন কেমন করে দেশ সমাজ-রাজনীতিতে ধীরে ধীরে বদল আসল তেমনি দেখেছেন দেশের স্বাধীনতার আগের ও পরের ভারতবর্ষকে। আর এই জীবন অভিজ্ঞতাই তাঁকে জীবন শিল্পীতে পরিণত করেছে। এছাড়া ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন দক্ষ প্রশাসক। স্বাধীনতার আগে ইংরেজ সরকারের এবং স্বাধীনতার পরে কংগ্রেস সরকারের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নানান সময়ে পালন করেছিলেন। শুধু তাই নয় দেশের ও দশের উপর দিয়ে যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, আগস্ট আন্দোলন, মন্বন্তর, দাঙ্গা দেশভাগের মতো ঝড়-ঝাপটা বয়ে যাচ্ছিলো তখন তিনি নিজের চোখে এই সমস্ত ঘটনা প্রশাসনিক চেয়ারে বসে দেখেছেন। জীবন ও সমাজকে তিনি নানাভাবে রদবদলের মুহূর্তের পরিবর্তনকে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তিনি একজন যথার্থ জীবনশিল্পী হতে পেরেছেন। চাকরির সূত্রে বিভিন্ন সময় তাঁকে সপরিবারে গ্রামবাংলার মফঃস্বল শহরে যেতে হয়েছিল। সেই সময়ই তিনি এই সমস্ত মানুষদের জীবন যন্ত্রণা ও জীবন অভিজ্ঞতার কথা খুব কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন। তিনি অনেক সময় অনেক ভাবে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার কথা খুলে বলতে চাইলেও প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিলেন বলেই তা বলতে পারতেন না। আর এই না বলার যন্ত্রণার জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে অনেকবারই চাকরি ছেড়ে স্বেচ্ছায় সাহিত্যচর্চা নিয়ে থাকতে চেয়েছেন। কিন্তু পরিবার ও সন্তানদের দায়িত্ব তাঁকে তাঁর সেই বাসনাকে পূরণ হতে দেয়নি। সেই কারণে অন্নদাশঙ্কর রাজনৈতিক জটিলতার কথা তাঁর গল্পে অনেকটা রূপকের আদলে ব্যবহার করে পাঠককে ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করতেন। ছোট থেকেই অন্নদাশঙ্কর একজন বড় সাহিত্যিক হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়েছেন। সে কারণেই তিনি স্কুলজীবন থেকেই লাইব্রেরী কিংবা কোনো দোকানে পড়ার বই থাকলে তা সংগ্রহ করে পাগলের মতো সেখানে ডুবে থাকতেন। আর পড়ার প্রতি তাঁর এই আকর্ষণই তাঁকে একজন ক্লাসিক্যাল সাহিত্যিকের আসন তৈরি করে দিয়েছিল। এছাড়া আই.সি.এস পরীক্ষায় প্রথম ভারতীয় হিসেবে প্রথম হয়ে বিলেতে যাওয়া তাঁকে আর এক অন্যমাত্রায় পৌঁছে দিয়েছিল। কারণ এই সময়ই অন্নদাশঙ্কর পাশ্চাত্যের জীবন ও সাহিত্য বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ

করেছিলেন। শুধুমাত্র দেশীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে নয় পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে জানার আগ্রহ ছিল তাঁর অসীম। জীবনে তিনি যেমন প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথকে নিজের সাহিত্যিক গুরু হিসেবে বরণ করে নিয়েছিলেন তেমনি লিও টলস্টয়কেও তিনি সাহিত্যের আদর্শ হিসেবে ভাবতেন।

অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের বিশ শতকের রাজনৈতিক পালাবদলের অস্থির দিনগুলিতে জীবনানুরাগ, সাহিত্য জিজ্ঞাসা, রূপ জিজ্ঞাসার রসকে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় রসায়িত করে এক ভিন্নমাত্রার সাহিত্যিক হিসেবে অন্নদাশঙ্কর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। আর এই অন্যধারায় সাহিত্যের আঙ্গিনায় পড়ে তাঁর ছোটগল্পগুলি। তাঁর মোট একানব্বইটি গল্পকে যদি আমরা দুটি পর্বে দেখি তবে প্রথম পর্বে (১৯৩০-১৯৫৬) তিনি বাহ্যিক মানব জীবনের বাস্তবতাকে অন্বেষণ করেছেন। দ্বিতীয় পর্বে (১৯৫৬-২০০২) তিনি মানব জীবনের অন্তরের তথা মননের বাস্তবতাকে খুঁজে বের করে এনেছেন। আর তাই বোধহয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পগুলির মতো তাঁর গল্পে খাঁটি বাস্তবতা ও খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষদের কথা সেরকম ভাবে পাই না। কারণ অন্নদাশঙ্করের ছোটগল্পগুলির কাহিনি হাস্যরসাত্মক ও ব্যঙ্গার্থক, নারীজাগরণের ভাবনা, স্বাধীনতা ও দেশভাগের উন্মাদনা দিয়ে সাজানো 'আমার কথা' গ্রন্থে অন্নদাশঙ্কর রায় বারবার রবীন্দ্রনাথ, টলস্টয়, গান্ধীজী, রোম্যাঁরোলাঁ, প্রথম চৌধুরীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। কারণ অন্নদাশঙ্করের ভাবনায় বারবার এসেছে কি লিখবো? —এই সব আর্টিস্ট জিজ্ঞাসার উত্তর তিনি খুঁজে পেয়েছেন এই সমস্ত মনীষীদের কাছে। দেশ-বিদেশের বহু ঘটনা এবং ভ্রমণ অভিজ্ঞতা, এছাড়া চাকরির সূত্রে বিভিন্ন জটিল রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হওয়া— এই সমস্ত জীবনদর্শনই তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যে। আর তাই তো গভীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চেতনা, প্রখর বাস্তবজ্ঞান ও অভ্রান্ত জীবনবোধ উপলব্ধি করে দেয় তাঁর প্রতিটি ছোটগল্প। অন্নদাশঙ্করের জীবন যাত্রার পথ বয়েই চলেছিল এক বিচিত্র রাজনৈতিক ও সামাজিক সময়সীমার মধ্যে দিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলন, দেশভাগ, দাঙ্গার মতো অস্থির পরিস্থিতিগুলি যখন সমাজ ও দেশের ভেতর বাহিরকে বদলে দিচ্ছিল তখনি

অন্নদাশঙ্কর রায়ের কলম ধরা আর তাই তো তাঁর ছোটগল্পগুলির রূপ ও বিষয় বারবার বদল ঘটেছে। আর এজন্যই তিনি জীবন ও সাহিত্যকে যেমন নতুন ভাবে দেখতে চেয়েছেন তেমনি মনন ও মানসিকতাগুলির বদলকে নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরেছেন। তাই তো অনেক ছোটগল্পেই তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও শিল্পীসত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। যেখানে উঠে এসেছে সমসাময়িক রাজনৈতিক ভাবনার সঙ্গে বাঙালি চেতনার বহুমুখ। এছাড়া অন্নদাশঙ্কর তাঁর গল্প বলার ঢঙকে নতুন আঙ্গিক ও শৈলীতে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন— যা তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব ধারা বলা যায়। আসলে তাঁর গল্পে বক্তব্যটাই আগে আসে, আর তাকে ঘিরে তৈরি হয় ঠাস বুনন। আমরা আমাদের গবেষণামূলক অভিসন্দর্ভটিকে মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি—

প্রথম অধ্যায়

অন্নদাশঙ্কর রায় : জীবন ও সাহিত্য

বাংলার বাইরে থেকেও বাংলাকে ভালোবেসে যারা সাহিত্যের আসনে বাংলা সাহিত্য চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন অন্নদাশঙ্কর তাঁদের মধ্যে একজন অন্যতম প্রতিভাবান সাহিত্যিক। ১৯০৪ সালের ১৫ মার্চ, ওড়িশার ঢেঙ্কানলের করদরাজ্যে তাঁর জন্ম। তাঁর শৈশব ও যৌবনের অনেকটা সময় কেটেছে এই অঞ্চলেই। তাই তাঁর লেখনীতে অনেকবার আমরা খুঁজে পাব ওড়িশার প্রাকৃতিক পরিবেশের সৌন্দর্যমাখা দিনগুলি। নিমাইচরণ রায় ছিলেন তাঁর পিতা। তিনি কাজ করতেন ঢেঙ্কানলের রাজার রাজ কর্মচারী হিসেবে। ছোটবেলা থেকেই অন্নদাশঙ্কর পড়াশোনায় খুবই মেধাবী ছিলেন। আর তাই ১৯২৫ সালে ইংরেজি সাহিত্যে সাম্মানিক বি.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়েছিলেন তিনি। কৈশোর থেকেই ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অসম্ভব আগ্রহী ছিলেন। এরপর ১৯২৬ সালে আই.সি.এস পরীক্ষাতে রেকর্ড নম্বর পেয়ে প্রথম হলে তিনি প্রশিক্ষণের জন্য চলে যান বিলেতে। ১৯২৭ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত বিলেতে বিভিন্ন কলেজে তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন। এই পর্বেই তিনি পরিচিত হন পাশ্চাত্য সভ্যতার বিভিন্ন ইতিবাচক দিকগুলির সঙ্গে। বিলেতে পড়া শেষ করে তিনি দেশে ফিরে হন প্রথম জেলা ম্যাজিস্ট্রেট।

অন্নদাশঙ্কর তাঁর কর্মজীবনে বিভিন্ন সময় বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৪০ সালে তিনি যেমন বিচারক হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন তেমনি আবার ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিচার বিভাগের সচিব পদে যোগ দিয়েছিলেন। শুধু দক্ষ প্রশাসকই নন সেই সঙ্গে অন্নদাশঙ্কর ছিলেন একজন সাহিত্যপ্রেমী মানুষ। শুধুমাত্র আবেগের দ্বারা তাড়িত হয়ে তিনি সাহিত্য লিখতেন না, এক্ষেত্রে তিনি বরাবরই মুক্তমনের অধিকারী ছিলেন। নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণ করার এক ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা ছিল তাঁর মধ্যে। কোনো বিষয়ে বৈরিতা তিনি যেমন প্রদর্শন করতেন না তেমনি তাঁর সাহিত্যরচনাগুলি বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তিযুক্ত শব্দসম্ভারে সাজিয়ে তুলতেন বলেই তিনি এতবড় মাপের একজন জীবনশিল্পী হতে পেরেছেন।

অন্নদাশঙ্কর কিছুদিন চাকরি করার পরেই চাকরি ছাড়তে চেয়েছিলেন কেবল একনিষ্ঠভাবে সাহিত্য সাধনা করবেন বলে। শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে তাঁর এই বাসনা আরো বেশি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পরিবার ও পরিজনদের জন্য তিনি চাকরি ছাড়তে পারেননি। চাকরির সূত্রে বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করতে হতো তাঁকে। আর সেই সব অঞ্চলের সাধারণ মানুষদের সঙ্গে তিনি সহজেই মিশে যেতেন বলেই এই সমস্ত জীবন অভিজ্ঞতার কথা আমরা তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে খুঁজে পাই। অন্নদাশঙ্কর একই সঙ্গে চতুর্মাত্রিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি একাধারে ছড়াকার, কথাসাহিত্যিক, সুবিখ্যাত ভ্রমণ সাহিত্যিক, এবং বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক। বিবেকবান অগ্রপথিক হিসেবে তিনি যেমন বাংলা সাহিত্যে বিরাজ করছেন তেমনি সাহিত্যের এই চার শাখায় তাঁর উজ্জ্বল পদচিহ্ন আঁকা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য ও ছোটগল্প সম্পর্কে অন্নদাশঙ্কর

আসলে আধুনিক সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল ছোটগল্প। যার মাধ্যমে লেখক মানব জীবনের সেই অংশ তুলে ধরেন যা শাশ্বত জীবন আর মানববোধের মূর্ত কিংবা বিমূর্ত ছবি। আর তাই ছোটগল্পকে কোনো সংজ্ঞার নিয়মকানুনে বাঁধা যায় না বলেই এর বিচরণ বহুমাত্রিক।

এই বহুমাত্রিক হওয়ার কারণ গল্পকারদের নিজের নিজের ভাবনা এতে সংমিশ্রণ ঘটে বলেই এই আঙ্গিক ও শৈলী বিভিন্ন লেখক ও শিল্পীর হাতে ভিন্ন ভিন্ন হয়। অন্নদাশঙ্কর রায় ছিলেন একজন প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক ও ছড়াকারের পাশাপাশি ছোটগল্পকার। তিনি ছোটগল্প লেখার আগে তা নিয়ে অনেক কাটাছেঁড়া বিশ্লেষণ করে তবেই ছোটগল্পের আঙিনায় পা রেখেছেন। তাঁর ছোটগল্পগুলির দিকে লক্ষ রাখলেই দেখবো তিনি ছোটগল্পগুলির কাঠামো নিয়ে কতোটা ভেবেছেন। আর সে কারণেই তাঁর গল্পের বিষয় ও কাঠামোর পরিবর্তন হয়েছে অনেক বার। অন্নদাশঙ্করের গল্পগুলি কখনো ছোট আকারের, কখনো বা বড় কিংবা মাঝারি আকারের হয়েছে। এমনকি অনেক ছোটগল্পে তো আমরা যেমন উপন্যাসের বীজ খুঁজে পাই, তেমনি সার্থক ছোটগল্পের পরিসমাপ্তিও তাতে লক্ষ করি। তাই তো তিনি এ বিষয়ে নিজেই জানিয়েছেন ‘বড় উপন্যাসের জন্য আমি আর কোনো বড় বিষয়বস্তু দেখছি না। ছোট উপন্যাসের জন্য অর্থাৎ তিনখণ্ডে সমাপ্ত প্রায় হাজার পৃষ্ঠার পুঁথির জন্যে বিষয়বস্তুর অসদ্ভাব হবে না। কৌলিক বা পারিবারিক জীবন অবলম্বন করে এমন বহু উপন্যাস লেখা যায়। শ্রেণিবদ্ধ বা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন থেকেও এমন অনেক উপন্যাস আসবে। বাংলাদেশের পাঠকরাও ক্রমে তার জন্যে তৈরি হচ্ছেন। তবে লেখকরা তৈরি নন। তাঁরা এখন তিনশ পৃষ্ঠা খরচ করে দেড়শ পৃষ্ঠার বড় গল্প লেখার পক্ষপাতী, নাই বা হল আর্ট।’

আসলে লেখালেখি ব্যবসাতে পরিণত হয়ে যে আর্টের বারো বাজিয়ে দিচ্ছেন শিল্পীরা তা অন্নদাশঙ্করের মতো ক্লাসিক্যাল সাহিত্যিকরা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই এই ইঙ্গিত দিয়ে উপন্যাসে ও ছোটগল্পের ফারাক বুঝিয়েছেন। আর তাই তিনি বলেছেন, উপন্যাসের সঙ্গে ছোটগল্পের প্রভেদ শুধু পরিমাণগত নয়, প্রকৃতিগত। উভয়ের প্রাণ একই জায়গায়, যেন তরুর প্রাণ ও তৃণের প্রাণ। উপন্যাসের ডাল-পালা ছাঁটলে সে ছোটগল্প হয় না। ছোটগল্পকে পল্লবিত, প্রসারিত করলে সে উপন্যাস হয় না। উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য সে পাঠককে একটি বিশিষ্ট জগতের প্রবেশ দ্বার খুলে দিয়ে, বিচরণ করা, আলাপ করা, প্রেমে পড়া। ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য একটি বিশিষ্ট জগতের ঘোমটা খুলে একটুখানি দেখায় আর বলে, পাঠক যথেষ্ট হয়েছে, অনেক দেখেছ, আর দেখতে চেয়ো না। উপন্যাসে ঔপন্যাসিক ক্রমাগত সুতো ছাড়তে থাকেন, মাছকে

অনেকক্ষণ ধরে খেলিয়ে তারপর ডাঙায় তোলেন। ছোটগল্পকার জাল ফেলে তখনি তুলে নেন। অন্নদাশঙ্করের ছোটগল্পগুলি বিষয় ও আঙ্গিকগত দিক থেকে প্রতিটি চমক দেওয়ার মতো। একটুখানির মধ্যে পাঠককে তন্ময় ও অভিভূত করে খোঁচা দেওয়া তাঁর ছোটগল্পগুলির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কোথাও বর্ণনার আতিশয্য নয় বরং টানটান অনুভূতিই তাঁর গল্পগুলির একটি প্রধান লক্ষণ। এই অধ্যায়ে আমরা অন্নদাশঙ্করের ছোটগল্প বিষয়ে নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা এবং তাঁর একানব্বইটি গল্পে তাঁর প্রয়োগের ক্ষেত্রটিকে দেখিয়েছি। কোথায় ছোটগল্পের ভাবনায় তিনি মৌলিকত্বের জায়গা অধিকার করে আছেন এই অধ্যায়ে আমরা সেই দিকটিকেই তুলে ধরেছি।

তৃতীয় অধ্যায়

অন্নদাশঙ্করের ছোটগল্প: প্রবাসী বাঙালি জীবন

বাংলার বাইরে প্রবাসী বাঙালি জীবনচর্চা নিয়ে যে কয়েকজন বাঙালি লেখক সাহিত্যচর্চা করেছিলেন অন্নদাশঙ্কর ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। প্রথমত অন্নদাশঙ্করের জন্ম ওড়িশা জেলায় তথা বাংলার বাইরে ওড়িয়াভাষী অঞ্চলে। দ্বিতীয়ত পড়াশোনা থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে আই.সি.এস পরীক্ষা পাশ করার পর তিনি বাংলা তথা দেশের বাইরে যান। আর এই সমস্ত জীবনযাত্রাই অন্নদাশঙ্করের প্রবাসী বাঙালি জীবন অভিজ্ঞতা এনে দেয়। কারণ এই সময়পর্বগুলিতে অন্নদাশঙ্কর দেশ-বিদেশের বহু জায়গায় বহু মানুষের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। দেশ ও দেশের বাইরে বাঙালি জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর মধ্যে আয়ত্তে ছিল। তাই অন্নদাশঙ্করের অনেক ছোটগল্পের পরিমণ্ডল প্রবাসী বাঙালি জনজীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। আই.সি.এস পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার পর তিনি দেশের বাইরে গিয়ে অনেক বাঙালি পরিবারের সঙ্গে মিশে যাবার সুযোগ পেয়েছিলেন। আর এই অধ্যায়ে আমরা প্রবাসী বাঙালিদের জীবনচর্চা, তাদের অনুরাগ, ভালোবাসা ও সংস্কৃতিবোধ নিয়ে আলোচনা করবো। মাতৃভূমির সঙ্গে যেকোনো মানুষের একটা যে নাড়িরটান থাকেই এই মাতৃভূমি থেকে যতই দূরে যাওয়া যায় না কেন তা কাছে টানবেই— এই গূঢ়বন্ধন অন্নদাশঙ্করের ছোটগল্পের প্রবাসী বাঙালিদের মনন মেজাজে বারবার উঠে এসেছে।

অন্নদাশঙ্করের অনেক গল্পে এই প্রবাসী বাঙালিরা সুদূর ইউরোপে বসে তাদের নিজের মাতৃভূমি বিষয়ে যেমন আপন মনে কল্পনা করে গেছেন তেমনি আবার স্বদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক জটিলতা তাদের মধ্যে ভাবনার আলোড়ন তুলেছে। তাঁর অনেক গল্পে দেখা যায় এমন অনেক প্রবাসী বাঙালি চরিত্র আছে যারা পাশ্চাত্যের ভাবধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চললেও নিজের বাঙালিত্ব ও সংস্কৃতিকে বিলিয়ে দেয়নি। বরং আরো বেশি করে কাছে টেনে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেছেন। দেশের বাইরে থেকেও তারা বাংলার সংস্কৃতিচর্চার মধ্যে দিয়ে মাতৃভূমিকে স্মরণ করেছেন।

উদাহরণ হিসেবে অন্নদাশঙ্করের প্রথম পর্বের গল্পগুলি পাঠ করলেই দেখা যাবে সেই সমস্ত গল্প লন্ডনে বসে লেখা। আর এই সমস্ত গল্পে নানান ভাবে উঠে এসেছে প্রবাসী জনজীবন ও প্রবাসী বাঙালিদের মনন-মানসিকতার কথা। যেমন 'দু'জনায়' গল্পে উঠে এসেছে এক ইংরেজ তরুণী ও এক ভারতীয় বাঙালি যুবক মিস্টার চৌধুরীর প্রেমকাহিনি। দুই বর্ণের ও দুই জাতির নর-নারীর প্রেম সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে যেমন এই গল্পটিতে উঠে এসেছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির তফাৎ তেমনি আচার-ব্যবহারেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দুই ধারার ঘরানা। আবার 'পুত্রচরিত' গল্পে লেখক হরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্যের ছেলে হর্ষবর্ধন ভট্টাচার্যের বিলেত বাসের অধঃপতনের চিত্র তুলে এনে এক হাস্যরসাত্মক ব্যঙ্গাত্মক কাহিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। যেখানে প্রবাসী বাঙালি জনজীবনের আর এক অধঃপতন রূপ লেখক হর্ষবর্ধন চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে ফুটে তুলেছেন। অথচ হর্ষবর্ধনের বাবা ছেলেকে বিলেতে পাঠিয়ে সবার কাছে গর্ববোধ ও অহংকার করে। কিন্তু বাস্তবে যে ছেলে বিলেতে গিয়ে নষ্ট হয়ে গেছে সে কথা জানতেন না। এছাড়া এই গল্পের মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে প্রবাসী বাঙালিদের দলাদলি, পলিটিকাল নানান আলোচনা। আর সেই দলের কেউ কমিউনিস্ট, কেউ সোশ্যালিস্ট, কেউ ন্যাশনালিস্ট, কেউ মোডারেটে বিশ্বাসী। বাংলার বাইরে সুদূর লন্ডনেও যে বাঙালিরা নিজেদের মধ্যে আর এক বাংলা গড়ে তুলেছে তা অন্নদাশঙ্করের '১৭১ হেনরিয়েটা রোড' গল্পের শুরুতেই বলা হয়েছে— 'বাংলার বাইরে যদি কোথাও বাংলা থাকে তবে সে ১৭১ হেনরিয়েটা রোড, লন্ডন, এন.ডব্লিউ. ফোর বাড়িটা এডওয়ার্ডর যুগের। বাইরে থেকে দেখতে জমকালো, যদিও ভিতরে অত্যাধুনিক

স্যানিটারি বন্দোবস্তের অভাব। বাঙালী যে কবে প্রথম এ বাড়িতে উপনিবেশ স্থাপন করলো তার ইতিহাস অদ্যাপি অলিখিত। কিন্তু বাঙালিরা এখানে অন্য জাতের লোককে ভিড়তে দেয় না।'

আবার 'অপ্সরা', 'যৌবন জ্বালা' প্রভৃতি গল্পগুলির মধ্যে দিয়ে প্রবাসী বাঙালি যুবকদের মানসিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। বিলেতের মতো স্বাধীন কুসংস্কারমুক্ত দেশে বাঙালি যুবকরা অনেক ক্ষেত্রে তাদের বাঙালি কুসংস্কারকে মনে পোষণ করে বিলেতি নারী বিষয়ে সমালোচনা করেছে। এই অধ্যায়ে আমরা অন্নদাশঙ্করের বিভিন্ন গল্প অবলম্বন করে তাঁর প্রবাসী বাঙালী জীবনচিত্রের পরিচয় তুলে এনেছি।

চতুর্থ অধ্যায়

অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছোটগল্প : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন ও দেশভাগের প্রতিফলন

অন্নদাশঙ্কর রায়ের যুগটাই একটা অস্থিরতার, অনিশ্চয়তার, হতাশার, অসহায়তার। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হল, দেশীয় রাজনৈতিক আন্দোলনগুলি একের পর এক জ্বলছিল যুবক প্রাণের স্বদেশীয় আবেগে, আবার উদ্যমহীনতায় নিভছিল কিছু পরেই। এই ভাবেই ওঠা-নামা করতে করতে যুবকরা যেন বা গভীর হতাশায় নিমজ্জিত মুখ হচ্ছিলো বুঝিবা ভাগ্যের নির্দেশেই। যখন বেকারত্ব চরম, ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থায়, দেশীয় অর্থনীতি-সমাজনীতি প্রায় পঙ্গু রবীন্দ্রনাথের স্থিতধী শিল্পপ্রাণ এক নির্দিষ্ট আদর্শের আলোয় বিভাসিত, তখনি ধীরে ধীরে এক পা দু-পা করে এগিয়ে এলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, আগস্ট আন্দোলন, দাঙ্গা, দেশভাগের মতো বিপর্যয়। যে বিপর্যয়ের আলোড়ন বাংলা তথা সমগ্র ভারতের সমাজ ও জীবনকে এক ভয়ঙ্কর অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে গিয়েছিল।

দেশে যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলনের উন্মত্ততা, দেশভাগের মতো মানবিক বিপর্যয় ঘটছিল তখন অন্নদাশঙ্কর ইংরেজ সরকারের প্রশাসনিক বিভাগে একজন প্রশাসকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। দেশের উপর দিয়ে বয়ে চলা এই ঝড়-ঝাপটা তিনি

নিজের চোখে দেখেছেন যদিও অন্নদাশঙ্কর মনে-প্রাণে গান্ধীপন্থীতে বিশ্বাসী ছিলেন তবুও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে থাকার দরুন তাঁকে রাজনৈতিক দিকে স্পষ্টভাবে দেখা যায়নি। শাসকের শাসনতন্ত্রের যন্ত্রে বাঁধা পড়ে অন্নদাশঙ্করের মতো বুদ্ধিজীবী লোককে সেদিন কাজ করতে হয়েছে নিশ্চুপ ভাবে। তাই প্রকাশ্যে তিনি প্রতিবাদ ও আন্দোলনের মিছিলে না আসলেও তাঁর কলম গর্জে উঠেছিল লেখায়। অনেক প্রবন্ধে আমরা সেই সময়কার নানান রাজনৈতিক জটিলতার মুক্তিযুদ্ধ ব্যাখ্যা যেমন তাঁর লেখায় পাই তেমনি তাঁর অসংখ্য ছোটগল্পের বিষয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। স্বাধীনতা আন্দোলন, দেশভাগের আধারের উপর নির্লিপ্ত হয়েছে। যে গল্পগুলি কাল্পনিক চরিত্রকে আশ্রয় করে লেখক তাঁর সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাগুলির কাহিনি নির্মাণ করেছেন। কারণ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে থাকায় তাঁর পক্ষে কোনো রাজনৈতিক জটিলতার গল্প লেখা খুবই সমস্যার ছিল বলে অন্নদাশঙ্কর এসব ক্ষেত্রে রূপকের ব্যবহার করেছেন।

অন্নদাশঙ্করের মন মেলে তো মনের মানুষ মেলে না গল্পে তিনি কথক খোকনের জবানীতে স্বদেশকর্মী নোটনদির রাজনৈতিক জীবন ও রাজনৈতিক ভাবনা-চিন্তার কাহিনি তুলে ধরেছেন। যেখানে নোটনদি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের পালাবদলে অহিংস থেকে সহিংস এবং সেখান থেকে কমিউনিস্টে পৌঁছে গেছেন ও নিজের মতো করে জনমত, দল তৈরি করে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন। তবে সমগ্র গল্পে নোটনদি দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজের স্বামী-সন্তানকে ত্যাগ করে যে আত্মবিসর্জন দিয়েছেন— এই দিকটিই বড় হয়ে উঠেছে। যতবারই সে বিফল হয়েছে ততবারই নোটনদি আশার নতুন দিশা নিয়ে এগিয়ে গেছে স্বাধীনতার লক্ষ্যে। আবার 'সবার উপর মানুষ সত্য' গল্পে উঠে এসেছে দেশ স্বাধীন হবার আগে নানান জাতীয় আন্দোলনের উন্মত্ততা ও অস্থিরতার কথা। গল্পটি অসহযোগ আন্দোলন থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ক্রিপস্‌ের প্রস্তাবের নানান ঘটনা ও কাহিনি উঠে এসেছে। দাঙ্গা ও মন্বন্তরে দেশে সাধারণ মানুষ যে অবক্ষয়ের দিকে পা বাড়িয়েছে তা বঙ্কু বিশ্বাসের কথায় যেমন উঠে এসেছে তেমনি জিন্নাহর পাকিস্তান দাবি ও তার ভিত্তিতে দেশভাগের মতো ঘটনা এই গল্পটি এক অন্যপথে নিয়ে গেছে। আবার 'জখমী দিল' গল্পে মল্লিকজীর মুখে উঠে এসেছে ভারতের জাতীয় আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক পালাবদলের আন্তর্জাতিক সব

ঘটনা। আবার 'দূরের মানুষ' গল্পে ইংরেজ সৈনিক ব্রিগেডিয়ার জ্যাকের কথায় উঠে এসেছে দেশভাগ ও দাঙ্গার মতো অমানবিক দৃশ্য। জ্যাকের দেখা এই দাঙ্গা ও দেশভাগের অস্থির পরিস্থিতিগুলি ছিল এই রকম, ওহ্ এমন বীভৎসতা আমি জীবনে দেখিনি। বিশ্বাসী করুণ আমাকে পৃথিবীর প্রত্যেক মহাদেশে লড়তে হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহতা আমি হাড়ে হাড়ে জানি। কিন্তু পাঞ্জাবে যা দেখেছি তার তুলনা হয় না এ একেবারে অন্য জিনিস। অর্থাৎ জ্যাকের দেখা পাঞ্জাবের দাঙ্গার কাহিনি এই গল্পে দেশভাগের পরিস্থিতিতে উঠে এসেছে। আবার 'অভিমন্যুর ব্যূহ' গল্পে কুশারি একজন স্বাধীনতা আন্দোলনের সদস্য। তার জীবন অভিজ্ঞতায় উঠে এসেছে স্বদেশী আন্দোলন ও রাজনৈতিক নানান দাবদাহ মুহূর্ত। এছাড়া এ গল্পে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশেরও নানান প্রসঙ্গ উঠে এসেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

অন্নদাশঙ্করের ছোটগল্প: নারীভাবনার বিবর্তন

'পারিবারিক নারীসমস্যা' নামক প্রবন্ধের এক জায়গায় অন্নদাশঙ্কর বলেছেন, বাস্তবিক নারীর অক্ষমতার উপর নির্ভর করে কতো কুপ্রথার যে সৃষ্টি হয়েছে বলে শেষ করা যায় না। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবার পুনর্বিবাহে বাধা, বরপণ, কন্যা বিক্রয়, স্ত্রী বিক্রয়, স্ত্রী বিনিময়, সহমরণ, অবরোধ, বিবাহ ভঙ্গে বাঁধা, স্বামী সৌভাগ্যের চিহ্ন ধারণ, কন্যাদান, স্বামী সেবা, বিবাহ, স্বামী প্রভৃতি অপমানকর শব্দের উৎপত্তি। তাই শেষে অন্নদাশঙ্কর প্রশ্ন তুলেছেন নারীকে সহধর্মিণী বলা গেছে, কিন্তু পুরুষকে সহধর্মী বলা হয় না কেন? আসলে অন্নদাশঙ্করের জীবন অভিজ্ঞতায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই ধারায় মিশে গেছে বলে তিনি এই সমস্ত বিষয় নিয়ে সুগভীর চিন্তা ও বিশ্লেষণ করতে পারতেন। আর সে কারণেই শুধুমাত্র প্রবন্ধে কিংবা উপন্যাসে তাঁর এই ভাবনার প্রতিফলন হয়নি, সেই সঙ্গে তাঁর ছোটগল্পগুলিতেও নারীভাবনার বিবর্তনের নানান দিক খুঁজে পাওয়া যায়। অন্নদাশঙ্করের গল্পগুলিতে নারীভাবনার দিকে দৃষ্টিপাত করলে প্রসঙ্গক্রমে পুরুষ ও পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থা এসে যায়। আবার তিনি নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে নারীর উচ্ছৃঙ্খল ও অমানবিক আচরণকেও প্রশ্রয় দেননি। তিনি নারীর প্রেম, সৌন্দর্য, অবদমিত ইচ্ছা, সামাজিক কুসংস্কারের ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের

অন্ধশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই, জাতীয়তাবাদ, ব্যক্তিত্ব প্রকাশের মূল্য দিয়েছেন। আর তাই অনেক উপন্যাসের পাশাপাশি অন্নদাশঙ্করের বহু ছোটগল্পে নারীচরিত্র পুরুষতন্ত্রের ঘেরাটোপে থেকে বের হয়ে এসে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তারাও অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের মতো মুক্ত-স্বাধীন ও ব্যক্তি স্বতন্ত্র হতে চেয়েছেন। আর তাই তো অন্নদাশঙ্করের ছোটগল্পের নারীরা কি ভাবনায়, কি স্বাবলম্বীতে, কি প্রেমে— সবদিক থেকে ব্যক্তিত্বময়ীর ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা সমাজের বাধা-নিষেধ ও কুসংস্কারের গণ্ডিকে অতিক্রম করে হয়ে উঠেছেন মুক্ত চেতনার ও মুক্ত মনের।

'বালিকাবধূ' গল্পে তাই তো কনক তার বালিকাবধূ মেনকাকে দিয়ে কুসংস্কার আচ্ছন্ন বাঙালি পারিবারিক নিয়মের প্রতি প্রতিবাদ জানিয়েছেন নারী মুক্তি ও নারী স্বাধীনতার। সে তার স্ত্রীকে শারীরিক, মানসিক ও কর্মের দিক থেকে পাশ্চাত্য ঘরানায় তৈরি করতে চেয়েছেন বলেই বালিকাবধূর ঘোমটা ও পতিসেবাকে অনীহার সঙ্গে দূরে সরিয়ে দিয়ে মেনকাকে আধুনিক হতে বলেছেন। এখানে কনক নারীর নারীত্বকে যেমন সম্মান দিয়েছে তেমনি তার মানবাধিকারকেও স্মরণ করে মুক্ত জগতে নিয়ে যাওয়ার কথা ভেবেছে। যা পুরুষতন্ত্রের শাসন ও শোষণকে লঙ্ঘন করে স্বাভাবিক সহজ-সরল জীবনকে তাদের দাম্পত্য সম্পর্ককে নিয়ে গেছে। আবার 'উপযাচিকা' গল্পের সুবর্ণ চরিত্রটি বেশ চোখে পড়ার মতো। কলকাতায় তার স্বামীর ষোলখানা বাড়ি থাকলেও সে হরিপদের সঙ্গে এক বিছানায় থাকতে চায়নি। কারণ হরিপদ ঢাকার চাটগাঁওয়ে বেশ্যালয়ে গিয়ে শরীরে কঠিন রোগ নিয়ে এসেছিল বলে। একসময় সুবর্ণ স্বামীকে দেবতার মতো সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু যখন স্বামীর দুশ্চরিত্রের কথা জানতে পারেন তখন ধন ও মানের কথা না ভেবে সোজা বিচ্ছেদের কথা তিনি ভেবেছেন। এখানেই সুবর্ণ একজন বীরাঙ্গনা নারীর ভূমিকা পালন করেছেন। আবার 'মন মেলে তো মনের মানুষ মেলে না' গল্পে নোটনদি একজন সাধারণ নারী থেকে স্বদেশকর্মী হয়ে উঠেছে। দেশের ও দশের স্বার্থে সে নিজের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, ভালো-মন্দ সব বিসর্জন দিয়ে দেশের স্বাধীনতায় মেতেছেন। সে প্রথমে কংগ্রেস করলেও যখন কংগ্রেসের অহিংস পথের প্রতি তার আস্থা ভেঙে যায় তখন সে নিজের প্রচেষ্টায় কমিউনিস্ট দল গঠন করেন। সাধারণ শ্রমিক ও কৃষকদের

নিয়ে সে স্বপ্ন দেখে তারাই একদিন দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা ও বিপ্লব নিয়ে আসবে। আবার 'অপ্সরা' গল্পে লেখক পাতায় পাতায় ফুটিয়ে তুলেছেন পুরুষতন্ত্রের শিকলে বাঁধা নারীর অন্তর্বাসের জীবন-যন্ত্রণার কথা। সেখানে নিরুদি তার শ্বশুরবাড়ি ও স্বামীর শাসনে নিজের ভালো-মন্দ-ইচ্ছা-বাসনা সব ভুলে গেছে। সবসময় তাকে নিয়মের মধ্যে থেকে দিন কাটাতে হয়। স্বামী জীবনবাবু উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক হলেও পরিবারের প্রথাকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে বলেই সেও নিরুদিকে নিজের শাসনে রাখতে চায়। জীবনবাবুও চায়নি নিরুদি তার শখের গানবাজনার চর্চা করুন। এছাড়া 'যৌবন জ্বালা', 'রাণীপসন্দ', 'নারীচরিত্র পুরুষ ভাগ্য', 'কতকালের চেনা' প্রভৃতি গল্পে অন্নদাশঙ্কর রায়ের নারীভাবনার বিবর্তনের প্রতিরূপ বিভিন্ন বিষয় ও ভাবনায় ফুটে উঠেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অন্নদাশঙ্করের ছোটগল্প : আঙ্গিক বিচার

খুবই সহজ করে বলতে গেলে আঙ্গিক হল লেখকের মনন, চিন্তন ও অনুভবের নিজস্ব যে রীতি সেটাই আঙ্গিক। আর এর মধ্যেই লেখক বা শিল্পীর সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ পায়। অন্নদাশঙ্কর রায়ের উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ বা ছড়া যার কথাই বলি না কেন, প্রত্যেক সংরূপের আঙ্গিক ভিন্নমাত্রার। সমালোচকদের তাই তাঁর সাহিত্যের আঙ্গিকগত দিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন। অন্নদাশঙ্করের গদ্যরীতির এক উল্লেখযোগ্য দিক তাঁর সংলাপ রীতি। দীর্ঘ, সংলগ্ন, কখনো ঈষৎ শিথিল, সেই সংলাপের সুর। আর সেই সংলাপ বা কথোপকথনে আছে পরিশীলিত ও মননশীল রূপ যেমন তেমনি আছে নিরাসক্ত আবেগ ও বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তির খেলা। তাতে অনুপ্রাস আছে, আছে হাস্যরস, কখনো কথার জন্য কথা, কিন্তু সর্বত্রই ও সর্বদাই এক শৈল্পিক প্রয়োজন ও নান্দনিক তৃপ্তির হাত ধরে আসে। শুধু তাই নয় সেই সব সংলাপে সরলতা ও বিশুদ্ধতার স্বাদ পাওয়া যায়। তাঁর সংলাপ কথা বলে। শব্দ দিয়ে ছবি, টুকরো টুকরো ছবি দিয়ে কথা, কখনো বর্ণনার কখনো অনুভবের— তাঁর আঙ্গিকগত শিল্পের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আর তাঁর বাক্যগঠন প্রসঙ্গে যদি বলি তবে শব্দ নির্বাচন যদি মূলত সাহিত্যের বাক্-রীতির হয়, তবে বাক্যগঠন মূলত কথ্যবাক্-রীতির। লক্ষ করার বিষয় সরলবাক্য গঠনের

দিকেই তাঁর প্রবণতা বেশি। জটিল বা যৌগিক বাক্যকেও তিনি প্রায়ই সরলে ভেঙে দিতে চান। আর জটিল বাক্যের ক্ষেত্রে সংযোগকারী শব্দগুলিকে রাখতে চান সরল। তাঁর বাক্য কাঠামোয় কিন্তু কখনো আড়ষ্ট বা শ্রুতিকটু হয়ে ওঠে না।

অন্নদাশঙ্করের ব্যক্তিগত কথায় যদি আমরা আসি, তাহলে দেখবো যে, তাঁর জীবনের স্বপ্নই ছিল তিনি হবেন শক্তিশালী ও সুচতুর লেখক। আর তাই তো তাঁর প্রথম জীবনের রচনায় যে রীতি, অন্বয় এবং আঙ্গিক লক্ষ করা যায়, তা পরবর্তীকালে পরিণত বয়সের গদ্যে সেই প্রবহমান অনুসৃতি ও বিবর্তন লক্ষ করা যায়। তাঁর লেখনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বাক্যের সরলতা ও স্নিগ্ধতা। অবশ্য সেটা সম্ভব হয়েছে— ছড়া, বাউলের সংসর্গের জন্যই। তাই তো তিনি নিজেই বলেছেন, জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে গিয়ে তিনি আর্টকেও সরল, নিরাভরণ ও অকপট করেছেন। অন্নদাশঙ্করের ছোটগল্পের আঙ্গিক প্রথাগত দিক থেকে আলাদা হওয়ার পশ্চাতে রয়েছে পারিবারিক জীবনে বৈষ্ণবীয় প্রভাব, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর দর্শন, টলস্টয়, গ্যেটে প্রমুখ মনীষীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংস্পর্শ এবং সবিশেষ পুত্র চিত্রকামের মৃত্যুশোক— সব মিলিয়ে এমন এক অন্তর্দৃষ্টি গড়ে ওঠে যে তার প্রভাব পড়ে অনেক গল্পেই। সেই দিক থেকে অনেক গল্প দুর্বোধ্য মনে হতে পারে কিন্তু অসাধ্য নয়। বরং সেগুলি এক আশ্চর্য রসোত্তীর্ণ কাহিনি হয়ে উঠেছে। মনে রাখার বিষয় তিনি একজন মননশীল সাহিত্যিক। তাই তাঁর বেশিরভাগ গল্প যুক্তি-তর্ক, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণমূলক। সহজ-সরল শব্দ ও বাক্যে গভীর ভাবনার প্রকাশ— যা পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু তাঁর গল্পে ঝড়ের গতিতে পাঠকদের রস আস্বাদন করা সহজসাধ্য নয়। মননশীল সাহিত্যিকের গল্প মনোযোগ দিয়েই পাঠ করতে হয়। আর তাহলেই তাঁর ছোটগল্পের আঙ্গিক সম্পর্কে নিখুঁত ধারণা পাওয়া যাবে।

উপসংহার

বাংলা সাহিত্যের বিশ শতকের শেষ অতন্দ্র প্রহরী হলেন অন্নদাশঙ্কর রায়। তাঁকে জীবনদর্শন ও জীবন অভিজ্ঞতার পাশাপাশি জীবনশিল্পীর দিক থেকেও বিশশতকের শেষ মনীষী বলা হয়। জীবনের নানান জটিলতার মাঝেও তিনি যে ভাবে বাংলা সাহিত্যকে সাজিয়ে গেছেন সত্যিই

তা এক অন্য তাৎপর্য বহন করে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জীবন অভিজ্ঞতা এবং কর্মজীবনের নানান উপলব্ধি তাঁর লেখার মেজাজ ও মর্জিকে বদলে দিয়েছে। যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে সাজানো তাঁর সংলাপ ও বক্তব্যগুলি বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিকগত, শৈলীগত দিক থেকে এক অন্যমাত্রা পেয়েছে।

শুধুমাত্র প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছড়ার ক্ষেত্রে নয় ছোটগল্পের ধারাতেও অন্নদাশঙ্কর অনেক বেশি সাবলীল ছিলেন বলেই ছোটগল্পের ভাবনাকেই তিনি নিজের কলমে বদলে দিয়েছেন। আর তাই তো ছোটগল্পের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি যেমন খুবই স্পষ্টভাবে উপমার সঙ্গে উপন্যাস ও ছোটগল্পের পার্থক্য বুঝিয়ে গল্পের ধারণাটি নিয়ে আসেন যা শ্রেণিগত দিক থেকে এক সম্পূর্ণ অভিনব ভাবনা ও আলোচনা বলা যায়। শুধু আলোচনা কিংবা ভাবনায় নয় অন্নদাশঙ্কর নিজেই ছোটগল্প রচনা করে তাঁর চিন্তা ও ধারণাকে প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন।

বিষয়গত দিক থেকে দেখলে আবার অন্নদাশঙ্করের ছোটগল্পগুলি নানান বৈচিত্র্যের অবদান বহন করে। কারণ সুদীর্ঘ জীবন অভিজ্ঞতা ও সুস্পষ্ট বুদ্ধিদীপ্ত ভাবনা তাঁর গল্পের কাহিনিগুলিকে অভিনবত্বের ছোঁয়া লাগিয়েছে। তাঁর গল্পে একদিকে আছে নারীভাবনার বিবর্তনের নানান দিক, অন্যদিকে আছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দেশভাগ, দাঙ্গা, স্বাধীনতা আন্দোলনে নানান ঘটনা। চরিত্র ও সংলাপের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও মনস্তত্ত্বের চাষ করে কাহিনিকে পাঠকের কাছে ছেড়ে দেওয়া— তাঁর গল্পের একটি অন্যতম প্রধান দিক।

তবে অন্নদাশঙ্কর ছোটগল্পের মধ্যে প্রবাসী বাঙালী জীবনের বর্ণনা একটি সম্পূর্ণ অভিনবত্বের দিক। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেছেন বলে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন বাংলার বাইরে থাকা প্রবাসী বাঙালিদের জীবনচর্চাকে। আর সেই জীবনচর্চাকেই তিনি তাঁর গল্পের কাহিনিতে স্থান দিয়েছেন যেখানে উঠে এসেছে এই সমস্ত বাঙালিদের মনন-মানসিকতা, স্বদেশ ভাবনা ও সংস্কৃতিবোধ। অন্নদাশঙ্কর রায় এমন একজন ব্যক্তিত্ব দীর্ঘায়ু হওয়ার কারণে তিনি একদিকে দেখেছেন স্বাধীনতার আগের ও পরের ভারতবর্ষকে। শুধু তাই নয় ব্যক্তিগত জীবনে অনেক স্বনামধন্য শিল্পীর সান্নিধ্যে তিনি আসতে

পেরেছিলেন বলেই একজন জীবনশিল্পী হিসেবে তিনি বাংলা সাহিত্যে জায়গা অধিকার করে আছেন।

সহজ-সরল ভাষা, উপমা, প্রবাদপূর্ণ ব্যাখ্যা তাঁর ছোটগল্পগুলির এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য আর তাই আঙ্গিকগত দিক থেকেও অন্নদাশঙ্করের ছোটগল্পগুলি মৌলিকত্বের দাবি রাখে।